শ্যামলকুমার সেন

এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব

সুশীল ভট্টাচার্য
সহযোগিতায়
নির্মলকুমার নাথ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রসঙ্গত

ব্যবহারজীবী শ্যামলকুমার সেন, প্রধান বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন, রাজ্যপাল শ্যামলকুমার সেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামলকুমার সেনকে আমি আশির দশকের একেবারে শুরুতেই ভালো রকমে চিনতাম, জানতাম। প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রমিক নেতা প্রয়াত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হিসাবে আমাকে প্রায়ই আনন্দবাবুর দূত হিসাবে হাইকোর্টে বিভিন্ন খ্যাতনামা মানুষজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যেতে হতো। এভাবেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোককুমার সেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী পাল, রাজ্য পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ভোলানাথ সেন, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা, বিচারপতি পদ্মা খাস্তগীর, পরবর্তীকালে বিচারপতি প্রতাপ রায় প্রমুখ অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির (আনন্দবাবু সেইসময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন) গাড়িতে করে হাইকোর্টে যেতাম। সেই সময় দেখতাম লম্বা ছিপছিপে গঠনের একজন সৌম্যদর্শন যুবক হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে নিজস্ব মামলা পরিচালনা করছেন। তখন যদিও তাঁর সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ হয়নি তবু হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করে এমন দু-একজনের কাছে জেনেছিলাম ওনার নাম শ্যামলকুমার সেন। তার অনেক পরে তাঁর সঙ্গে আমার আলাদা পরিচয় হয়। দুর্গাপুরে আমি যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম সেই স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি কিংবা উদ্বোধক হিসাবে নিয়ে গেছি বহুবার। এছাড়া দুর্গাপুর নগর নিগমের অনুষ্ঠানে, ডা: বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি রক্ষা কমিটির অনুষ্ঠানে এবং পরবর্তীকালে আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচীতে তাঁকে দুর্গাপুরে নিয়ে এসেছি। আমি যখন বলেছি তখনই তিনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন আমার আহ্বান তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করেননি। শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে আমার অনুষ্ঠানে এসে মনোগ্রাহী বক্তব্য রেখেছেন আবার অনেক রাতে কোলকাতা ফিরে গেছেন। এর ফলে মানুষ শ্যামলকুমার সেনকে আমার অনেক বেশি জানা হয়ে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-সমীহের ভাব তৈরি হয়েছিল এবং তাঁর হৃদয়ের কোথাও বোধ করি আমার জন্য একটা 'সফ্‌ঠ্‌ কর্নার' তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে যতই মিশেছি ততই আরও গভীরভাবে তাঁকে আমার জানা হয়েছে। তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছি, কোলকাতা থেকে গাড়িতে দুর্গাপুরে আসা-যাওয়ার পথে নানা গল্পগুজব করতে করতে গিয়েছি এবং এসেছি। আমার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির অনেকটাই তিনি তাঁর অবসর মতো পাঠ করেছেন ফলে তাঁরও আমাকে অনেকটাই জানা হয়ে গিয়েছিল। যত দিন গেছে ততই তাঁকে আরও ভালো করে জেনেছি, আরও ভালো করে চিনেছি। এসময় আমার মনে একটা গোপন

বাসনা জাগ্রত হয় যে আমি মানবহিতৈষী শ্যামলকুমার সেনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবো। কথাটা মনে অনেকদিন থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু উনি আমার প্রস্তাব কীভাবে নেবেন ভেবেই সরাসরি তাঁকে ব্যাপারটা জানাতে খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেয়ে বসেছিল। কারুকৃৎ-এর কর্ণধার জয়ন্ত সাহা আমার একজন গুণগ্রাহী। তিনি আবার শ্যামলকুমার সেনের ছায়াসঙ্গী হতে ভালোবাসেন। তিনি বাইরে কোথাও যাচ্ছেন শুনলে জয়ন্ত সাহা সব কাজ ফেলে তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে যান। একদিন জয়ন্ত সাহাকে সরাসরি বললাম 'আমি স্যার শ্যামলকুমার সেনের জীবনী লিখতে চাই। আপনি যদি স্যারকে বলে স্যারের অনুমতি নিতে পারেন তাহলে ভালো হয়। পাছে প্রত্যাখ্যাত হই সেই কারণে তাঁর কাছে সরাসরি প্রস্তাবটা রাখছি না। আপনি যদি সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করেন তাহলে ভালো হয়।' আমার কথা লুফে নিলেন জয়ন্ত সাহা। সঙ্গে সঙ্গেই স্যার শ্যামলকুমার সেনকে জয়ন্ত সাহা আমার প্রস্তাবের কথা জানালেন। উনি জয়ন্ত সাহাকে বললেন, 'সুশীলবাবুকে সঙ্গে করে এখনই তুমি আমার বাড়ি চলে এসো।' ওনার বাড়িতে গিয়ে চা-জলখাবার খেতে খেতে জানলাম সাংবাদিক নির্মলকুমার নাথ স্যারের জীবনী লেখার কাজে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং স্থির হলো আমরা দুজনে মিলে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করে শ্যামলকুমার সেনের বহুবিচিত্র জীবনের কিছু কিছু ঘটনা পাঠকদের উপহার দেবো। তাঁর জীবনীগ্রন্থ আরও বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম। লিখেও ছিলাম বিস্তারিত ভাবে। স্যারের বাড়িতে বসে তাঁকে আমার লেখা পড়িয়ে শুনিয়েছি। আত্মপ্রশংসা শুনতে তাঁর অনেক কুণ্ঠা। তাই অনেক কথাই বলা গেল না তাঁর মৃদু আপত্তিতে। আত্মপ্রচারে বিমুখ শ্যামলকুমার সেন খুব সাদামাটা ভাষায় তাঁর জীবনী লেখার জন্য বলেছেন। যখনই চোখা চোখা বিশেষণে ভূষিত করে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে গেছি তখনই উনি আমার হাত চেপে ধরেছেন—'থাক না, অত বেশি বেশি আমার সম্পর্কে না লিখলেও চলবে। লোকে কিছু ভাববে।' আমি বলতে চেয়েছি, 'না অতিশয়োক্তি কিছু লিখছি না। যা সত্য তাই লিখছি।' তা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় ওনার পূর্ণ সমর্থন না পাওয়ায় আমার লেখার কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে। তিনি আমাকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন লেখা অনেক বড়ো হয়ে যাচ্ছে—সংক্ষেপ করুন। এভাবেই কোন প্রকারে সব দিকে ভারসাম্য বজায় রেখে 'অনন্য 'শ্যামলকুমার সেন' প্রকাশের আলোতে এলো।

'পুনশ্চ'-এর কর্ণধার সন্দীপ নায়ক এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁকেও এই সুযোগে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

'প্রতীচী'
বর্ধমান

ড: সুশীল ভট্টাচার্য

নান্দীমুখ

এমন একজন মানুষের জীবনকথা, যাঁর জীবনের ভেতর দিকটা বাইরের দিকের চেয়ে অনেক বড়ো। হিমশৈলের মতো। সেই অন্তরালে বসে আছেন আসল মানুষ—নির্মোহ, অহংশূন্য, নিঃসঙ্গ, নির্বেদ। সময়ের স্রোত ঘটনার পর ঘটনায় চলে যায় দুপাশ দিয়ে—তিনি সাক্ষীপুরুষের মতো নিরাসক্ত হয়ে দেখেন। এটা চেষ্টিত নয়। এইটিই তাঁর চরিত্র। আমাদের শাস্ত্র বলবেন, এই হল শুদ্ধ অন্তঃকরণের উদাহরণ। স্বার্থশূন্য হয়ে তাঁর সংস্পর্শে না এলে এসব বোঝা যাবে না। তিনি প্রচারবিমুখ। 'আমিত্বের' খাঁচায় নিজেকে বন্দি করে রাখতে চান না। আনন্দ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তাঁর নিজস্ব একটা আলো আছে। বহির্জীবন সাফল্য নির্ভর, অন্তর্জীবন আত্মনির্ভর।

ইতিহাসে সেনবংশের বহু অবদান। নদীর মতো বহু বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা। এক সময় এঁরা রাজ্য শাসন করেছেন, যুদ্ধপরিচালনা করেছেন। রাজত্বের উত্থান পতনের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে ফেলেছেন। ইতিহাসের অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়ে সেনরা এই বর্তমানে এসে পৌঁছেছেন। একদিকে যেমন আছে বিত্ত-বৈভব-সমৃদ্ধি-বনেদিয়ানা আর একদিকে আছে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি। উভয়ে মিলে তৈরি হয়েছে 'সেন' সংস্কার।

এই জীবনীতে তাঁর ক্রম উত্তরণের বিবরণ হয়েছে। কীভাবে তিনি অতীত ও বর্তমানের গৌরবময় সেতুবন্ধন সম্ভব করে তুলেছেন তাঁর একক কৃতিত্বে সে কথাও আছে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁকেই নির্বাচন করেছেন আদি গৌরবের বাহক হিসাবে। পেছন থেকে একেবারে সামনের প্রেক্ষাপটে পাদপ্রদীপের আলোয় ঠেলে দিয়েছেন। যে-কোনো জায়গায় এই মানুষটির উপস্থিতি সেই জায়গাটিকে এক আলাদা আলোয় আলোকিত করে তোলে। সভায় সকলের মাঝে তাঁকে দূর থেকে দেখতুম। তখন তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বহু রকমের নিরাপত্তার বেড়াজাল। মনেই হত না এইসব ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন অথবা আড়ষ্ট। সহজ এক মানুষ, স্বচ্ছন্দ তাঁর বিচরণ। যখন তাঁর কাছাকাছি আসার সুযোগ তিনি নিজেই করে দিলেন, তখন বুঝতে পারলুম তাঁর অন্তঃপুরটি উচ্চমূল্যবোধে ঠাসা। তিনি ধর্মবিশ্বাসী। সেই ধর্ম অনেক গভীর, গহনচারী। ভারত ধর্মই তাঁর ধর্ম। ভারত সংস্কৃতির পূজারী। যৌথ পরিবার পছন্দ করেন তিনি। সকলকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। সকলের কথা ভাবেন। কর্তব্যপরায়ণ। আদর্শনিষ্ঠ। তাঁর ধর্মের

পরিসর সুদূরপ্রসারী। তাঁর জানার আগ্রহ কোনোদিন শেষ হবে না। ভালো একজন শ্রোতা। যে যাই বলুক—তিনি গভীর আগ্রহে শোনেন। বড়ো একজন সমঝদার। প্রত্যেকের মূল্যই তিনি বোঝেন। যার যা প্রাপ্য সেটি দিতে কখনোই সঙ্কুচিত হন না। এমন অনাবিল মানুষের অন্তর্জীবন বহির্জীবনকে ছাপিয়ে যায়। তাঁর কাছে থাকলে মনে ভীষণ প্রশান্তি আসে। একেই বলে charm.

পূর্বপুরুষের গুণাবলি উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ সংস্কার। এই জীবনীতে অতীত কলকাতার কথা স্বভাবতই এসেছে। শুধু আইন নয় ক্রীড়াজগতেও এই পরিবারের বহু অবদান। পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে উত্তর কলকাতার এই সেন পরিবারে। পূর্ব-পূর্বপুরুষ জায়গিরদার ফৌজদারি দিয়ে ইতিহাস শুরু করেছিলেন, নবাবি আমলে সেই ইতিহাসেরই অনুসৃতি স্বাধীন ভারতের রাজ্যপাল জাস্টিস শ্যামল কুমার সেন।

বহু গ্রন্থের লেখক ড: সুশীল ভট্টাচার্য অনেক পরিশ্রম করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন—অনেক অনেক প্রশংসা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

বাবা-মা এবং পরিবারের কথা	১৭
সেন পরিবারের পূর্বসূরীদের কথা	২২
পিতামহ মণিলাল সেন	২৯
কৈশোরজীবন : শিক্ষার অঙ্গনে শ্যামলকুমার	৩২
বাগবাজারের সেন পরিবার ও মোহনবাগান	৪২
শিমুতলার স্মৃতি	৫৯
রাজ্যপাল শ্যামলকুমার সেন	৬২
রাজ্যমানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	৭৩

॥ বাবা-মা এবং পরিবারের কথা ॥

অ্যারিস্টটল একবার বলেছিলেন যে, একজন মানুষ বিদেশ ভ্রমণ না করেও অনায়াসে আন্তর্জাতিক হতে পারেন। যাঁর পা-দুটি থাকবে দেশের মাটিতে অর্থাৎ ঐতিহ্যে। নয়ন দুটি বিস্তারিত থাকবে বিশ্বের চলমান ইতিহাসের দিকে আর প্রাণটি থাকবে মানুষের হৃদয়ে। শিক্ষকতা থেকে খ্যাতনামা আইনজীবী, আইনজীবী থেকে প্রধান বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি থেকে রাজ্যপাল, রাজ্যপাল থেকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে অভিষিক্ত শ্যামলকুমার সেন যদিও বিদেশে গিয়েছেন একাধিকবার কিন্তু প্রিয় জন্মভূমির প্রতি, স্বদেশের প্রতি একটা নাড়ির টান, শিকড়ের টান তিনি যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন।

শ্যামলকুমার সেনের জন্ম ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর কোলকাতার বাগবাজারের সেন পরিবারে। বাবার নাম দীনবন্ধু সেন। মায়ের নাম ফুলরানী দেবী। শ্যামলকুমার সেনের পিতামহের নাম মণিলাল সেন এবং পিতামহীর নাম নিরোদবালা দেবী। মণিলাল-নীরোদবালার তিন কন্যা ও দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ সেন। তাঁর ডাক নাম ছিল কানাই। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দীনবন্ধু সেন। দীনবন্ধুর জন্ম ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই। শ্যামলকুমার সেনের পিতার খুব ছোটোবেলা থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে একটা দাঁত উঠেছিল তাই বাড়ির সবাই তাঁকে আদর করে 'দাঁতি' বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালেও এই নাম তাঁকে পিছু ছাড়েনি। ময়দানেও তিনি 'দাঁতি সেন' নামেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। বাইরের লোক পর্যন্ত তাঁর আসল নাম একপ্রকার ভুলেই বসেছিলেন। তাঁর জন্মের

পরই মণিলাল সেন কোলকাতা কর্পোরেশনের ল' অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে তাঁকে পরিবারের সবাই 'বড়ো পয়মন্ত' ছেলে বলতেন। মণিলালই তাঁর নাম রেখেছিলেন দীনবন্ধু। তিনি হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। দীনবন্ধু সেন বি. এস. সি পাশ করার পর আইনের স্নাতক হয়ে আটর্নি হিসাবে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ক্রিকেট খেলাতেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শ্যামলকুমার সেনের বাবা দাঁতি সেনের বিয়ে হয় গোয়াবাগান নিবাসী অ্যাটর্নি ফণীন্দ্রনাথ বসু ও শৈলজা বসুর কন্যা ফুলরানী দেবীর সঙ্গে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে। শ্যামলকুমার সেনের মাতামহ ফণীন্দ্রনাথ বসুর মা অল্প বয়সেই পরলোকগমন করেন। শ্যামলকুমার সেনদের একান্নবর্তী যৌথ পরিবার ছিল, তেমনই তাঁদের মামাবাড়ির পরিবারদেরও ছিল যৌথ পরিবার। প্রতিদিন একশোজনের ওপর লোক বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতো। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে যৌথ পরিবারকে ধরে রাখার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা, স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন তা জন্মসূত্রেই অর্জিত হয়েছিল। গোয়াবাগানে এখনও শ্যামলকুমার সেনের মামাবাড়ির সাবেক বাড়ি আছে। তবে স্বাভাবিককারণেই এখন পরিবারের সংখ্যা সীমিত হয়েছে। শ্যামলকুমার সেনের দাদামশাই বাড়ির আর সকলের সঙ্গেই একসাথে বড়ো হয়েছেন। তিনি খুব খ্যাতনামা বড়ো অ্যাটর্নি ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ছাব্বিশ বছর মাত্র তখন তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। তিনি অত্যন্ত সৌম্যদর্শন ছিলেন। তাঁকে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের পীড়াপীড়ি ও অনুরোধ এলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বাবা রমেশচন্দ্র বসুও হাইকোর্টের একজন বড়ো অ্যাটর্নি ছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে শ্যামলকুমার সেনের দাদামশাই ফণীন্দ্রনাথ বসু তাঁদের বিশাল যৌথ পরিবারের সাত-আটজন জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন ও অন্যান্য গুরুজন-লঘুজনদের নিয়ে কী সুন্দরভাবে সব দিক মানিয়ে চলতেন। যৌথপরিবারে এই নিয়ে সকলকে মানিয়ে চলার নীতি তিনি সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতেন তা বালক শ্যামলকেও পরিবারের অন্যান্য ছোটোদের দারুণ মুগ্ধ করতো। শ্যামলের দাদামশাই বাড়ির সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন, ভালোবাসতেন। সকলেই সমান গুরুত্ব দিতেন। কাউকে ছোটো ভেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অনাদর করতেন না। সবদিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তাঁর ওপর পরিবারের সবাই নির্ভর করে যেন ভীষণ স্বস্তিতে থাকতেন। মামাবাড়ির এইসব ঘটনা ও মনোরম পরিবেশ

শ্যামলকুমার সেনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মাতুলালয়ে দুর্গাপূজা হতো মহাধূমধাম করে। পূজার একমাস আগে থেকে পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেতো। পরিবারের সবাই তখন দুর্গাপূজা কিভাবে আরও ভালোভাবে কাটানো যায় তারজন্য মানসিক প্রস্তুতিপর্ব চালাতেন। বালক শ্যামল পূজায় মামাবাড়ি যেতেন। কিন্তু বাগবাজারের বাড়িটার জন্য তাঁর মন কেমন কেমন করতো। মামাবাড়িতে এত লোকজন, আনন্দ উপভোগের এতো আয়োজন তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন মামাবাড়িতে থাকা বালক শ্যামলের হয়ে উঠতো না। তাই মামাবাড়িতে দু-একদিন কাটিয়ে বাগবাজারের বাড়িতে চলে আসতেন। আসলে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে তাঁর ততো ভালো লাগতো না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না শ্যামলকুমার সেনের দাদামশাইয়ের সঙ্গে একই পেশায় তাঁরও কাজ করার দুর্লভ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যা পরবর্তী জীবনে তাঁর বড়ো সহায়ক হয়েছিল। তখনকার দিনে শ্যামলকুমার সেনের দাদামশাই অ্যাটর্নি হিসাবে প্রখ্যাত জননেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বড়ো দাদা শরৎচন্দ্র বসর সঙ্গে কাজ করেছেন। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় যখন জেল খেটে ছাড়া পেতেন, তখন শ্যামলকুমারের দাদামশাইকে তিনি চিঠি লিখে জানাতেন। 'আমি দু-একদিনের মধ্যে আবার হাইকোর্টে ফিরবো। শরৎচন্দ্র বসুর ছেলে অমিয়নাথ বসু শ্যামলকুমার সেনের দাদামশাই-এর সঙ্গে কাজ করেছেন। অনেক মামলায় এইসময় তিনি শ্যামলকুমার সেনকে দিয়েও কিছু কিছু কাজ করিয়ে নিতেন। প্রতিদানে শ্যামলকুমার সিনিয়র থেকেছেন। উনি একসময় সাংসদ হয়েছিলেন আবার বার্মার রাষ্ট্রদূতও হয়েছিলেন। অমিয়নাথ বসু শ্যামলকুমার সেনকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। হয়তো বার লাইব্রেরীতে গেছেন শ্যামলকুমার সেন কিছু জরুরী কাজের জন্য। চেয়ার নিয়ে বসেও পড়েছেন। এমন সময় অমিয়নাথ বসু বার লাইব্রেরী ঢুকেই চেয়ারে বসা শ্যামলকুমার সেনকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন 'ফণিভূষণ বসুকে আমি বিশেষ সম্মান করি। উনি আমার বাবার সঙ্গে কাজ করেছেন।' তখনকার দিনের বাংলার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। আইনবিদ্, রাজনীতিবিদ্ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মেজদাদা। কত নাম ডাক তার। দেশ-বিদেশের মানুষ এক ডাকে তাঁকে জানতেন, চিনতেন। তখনকার দিনে টাকা প্রাপ্তি হয়তো নেহাৎ কম ছিল তা সত্ত্বেও দু-একটা ছোটোখাটো কাজ পেলেই অনেক আনন্দ পেতেন শ্যামলকুমার সেন। তবে কাজ যতই ছোটোখাটো হোক না কেন, অর্থপ্রাপ্তিও তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও সে কাজ ভালোভাবে করার

একটা প্রবণতা বরাবরই শ্যামলকুমার সেনের ছিল। তাই যথাসম্ভব নিজেকে ভালোভাবে তৈরি করতেন তিনি। বিচারপতি কী বললেন—খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যাতে পরে তিরস্কার না খেতে হয়। নিজের দাদামশাই-এর নানান পরামর্শ পেয়েছেন শ্যামলকুমার সেন। বলাবাহুল্য, এইসব অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে শ্যামলকুমার সেনকে বড়োই উপকৃত করেছে।

শ্যামলকুমার সেনের মামা সুনীলকুমার বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসে গোরার ভূমিকায় অভিনয় করে কলেজে উনি খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড: প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সেইসময় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ছেন তখন শ্যামলকুমার সেনের মামা সুনীলকুমার বসুও ওই কলেজে পড়তেন। 'গোরা' নাটকে গোরার ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিলেন। সুচরিতার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। শ্যামলকুমার সেনের মামার খেলাধুলায় এবং নাটকে সমান উৎসাহ ছিল। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় তিনি গ্রেফতারও হয়েছিলেন।

শ্যামলকুমার সেনের মা ফুলরানী দেবী বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তাঁরা দুই ভাই ও এক বোন। জ্যেষ্ঠ অমলকুমার সেন একজন বিশিষ্ট সলিসিটর। একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বাগবাজারের সেন পরিবারের অনেকেই আইনের সঙ্গে জড়িয়েছেন। প্রায় সকলেই ছিলেন অ্যাটর্নি বা সলিসিটর। শুধু শ্যামলকুমার সেনই কী করে যে অ্যাডভোকেট হয়ে গেলেন সেটাই বোধহয় রীতিমতো গবেষণার বিষয়। শ্যামলকুমার সেনের পিতা দীনবন্ধু সেনের শৃঙ্খলাপরায়ণতা ছিল উল্লেখ করার মতো। মণিলাল সেনের সময়ে বাগবাজারের সেন পরিবারের ছিল বিশাল একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারের নানান ধরনের সমস্যার সমাধানে পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলাপচারিতার মধ্যে সর্বশেষ মণিলাল সেনের সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য বলে মেনে নিতেন। কেউ কোন প্রতিবাদ করতো না। তিনি যা বলতেন, তিনি যাকে যে ভাবে চলার নির্দেশ দিতেন তিনি সেভাবে চলতেন। আনন্দের কথা দাঁতি সেনও উত্তরাধিকারসূত্রে এই বিরলগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সময়ে বিবিধ সমস্যা

সমাধানে তিনিই নিশ্চিত অবলম্বন ছিলেন। কী পরিবারের মধ্যে, কী ময়দানের ক্লাব পরিমণ্ডলে সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন অজাতশত্রু ব্যক্তিত্ব।

হাইকোর্টে দাঁতি সেনের অত্যন্ত সুনাম ছিল। শ্যামলকুমার সেন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করার দু'বছরের মধ্যেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দাঁতি সেন মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেই তাঁর কন্যার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় মেয়ের বিয়ে সাত দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পারলৌকিক কাজকর্ম হয়ে যাওয়ার পর তাঁর কন্যার বিয়ে হয়। বাবার এই আকস্মিক মৃত্যু শ্যামলকুমারদের কাছে ছিল একটা বড়ো আঘাত।